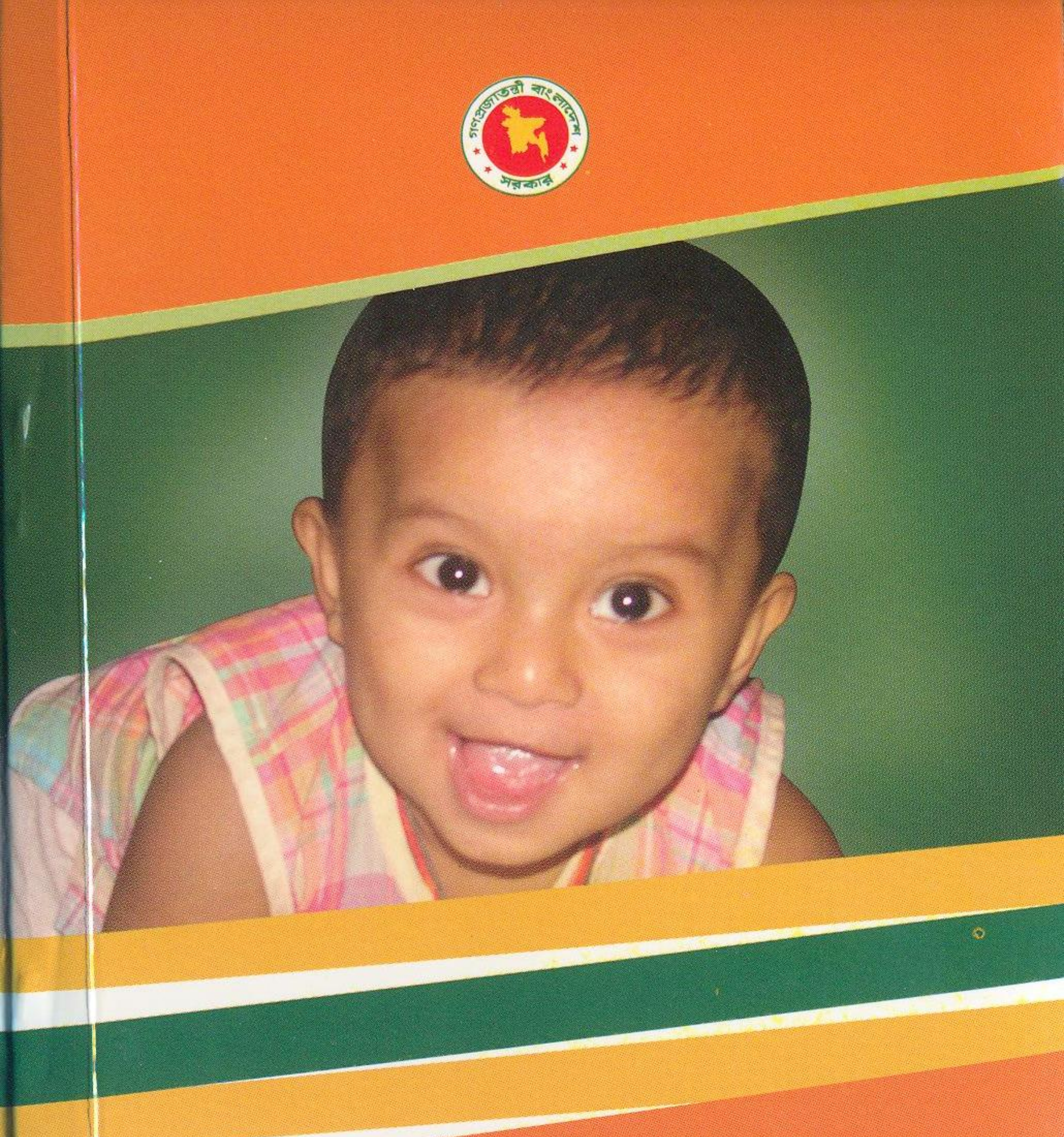

শিশুর যক্ষ্মা

মুখবন্ধ

শিশুরদেরও বড়দের মতো যক্ষ্মা হয় কিন্তু শিশুর যক্ষ্মা রোগকে এখনো তেমন গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় না। উপরন্তু কফ পরীক্ষার মাধ্যমে যত সহজে বড়দের যক্ষ্মা রোগ সনাক্ত করা যায় শিশুর বেলায় সেই সুবিধা পাওয়া যায় না, কারণ পরীক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় কফ শিশুদের বেলায় সংগ্রহ করা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এসব কারণে আমাদের দেশে শিশু যক্ষ্মা রোগী সনাক্ত হওয়ার হার অনেক কম। তবে রোগের উৎস খুজে বের করে যদি রোগী সনাক্ত করার চেষ্টা করা হয় তাহলে আরো বেশি শিশু যক্ষ্মা রোগী সনাক্ত করা সম্ভব। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যক্ষ্মায় আক্রান্ত পরিবারের কোন সদস্য রোগের উৎস হিসেবে কাজ করে। কাজেই স্বাস্থ্যকর্মীগণ সম্ভাব্য রোগের উৎস ও রোগী চিহ্নিতকরণ এবং ডাক্তারের সাথে পরামর্শের ব্যবস্থা করে আরো বেশি শিশু যক্ষ্মা রোগী সনাক্তকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। এই পুস্তিকা/বুকলেটটি স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও নির্দেশনা দিয়ে সেই কাজে সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশে শিশুর যক্ষ্মা পরিস্থিতি

বাংলাদেশে যক্ষ্মারোগের প্রকোপ অনেক বেশি। পৃথিবীতে যতগুলো দেশে যক্ষ্মারোগের প্রকোপ সবচাইতে বেশি, তার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ষষ্ঠ। এদেশে প্রতি বছর ৩ লাখেরও বেশি লোক ফুসফুসে জীবাণু পাওয়া যায় এমন ধরনের যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয় বলে অনুমান করা হয় অর্থাৎ প্রতিলক্ষ জনসংখ্যায় ১০০ জন এরকম রোগী পাওয়া যেতে পারে। এরমধ্যে শিশুরাও রয়েছে। প্রতিবছর যে পরিমাণ যক্ষ্মা রোগী এদেশে সনাক্ত হয় তার মধ্যে শিশু যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা মাত্র ৩ ভাগ। প্রকৃতপক্ষে এই সংখ্যা ১০ ভাগ হওয়ার সম্ভাবনা বলে ধারণা করা যায়। যেহেতু বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ, শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বড়দের মতো ততটা শক্তিশালী নয় এবং শিশুদের একটি বড়ো অংশ অপুষ্টিতে ভোগে, সে কারণে আমাদের দেশে শিশুরা যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়ার মারাত্মক ঝুঁকিতে রয়েছে।

শিশুদের মধ্যে যক্ষ্মা কীভাবে ছড়ায়

যক্ষ্মা রোগ জীবাণুর মাধ্যমে ছড়ায়। ফুসফুসের যক্ষ্মায় আক্রান্ত কোন ব্যক্তির হাঁচি, কাশি ও কফের মাধ্যমে জীবাণু বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে এবং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে শিশুর ফুসফুস ও শরীরে প্রবেশ করে। সাধারণত শিশুদের শরীরে যক্ষ্মা বড়দের কাছ থেকে সংক্রমিত হয়।

যক্ষ্মা রোগ যেভাবে ছড়ায় না

- হাতের স্পর্শ বা কোলাকুলি করলে
- একই থালা বাসনে খাওয়া বা একই গ্লাসে পানি পান করলে
- একই কাপড়, বিছানা বা বালিশ ব্যবহার করলে
- একই টয়লেট ব্যবহার করলে ইত্যাদি।

শিশুদের যক্ষ্মা রোগের ধরন

শিশুদের যক্ষ্মা দুই ধরনের

ক) ফুসফুসের যক্ষ্মা বা Pulmonary TB এবং

খ) ফুসফুসের বাহিরে অন্যান্য স্থানের যক্ষ্মা বা Extra Pulmonary TB

ফুসফুসের বাহিরে যক্ষ্মা শরীরের যে কোন স্থানে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তবে নিম্নলিখিত স্থানে সাধারণত বেশি হয়।

- গ্ল্যান্ড টিবি বা লসিকা গ্রন্থির যক্ষ্মা (Lymph nodeTB)- সাধারণত বগলে বা ঘাড়ে গুটির মত ফোলা দেখা যায়।
- হাড় বা অস্থিঃসন্ধির যক্ষ্মা (Bone or Joint TB)
- ফুসফুসের বা পেটের পর্দা বা আবরণীর যক্ষ্মা (Pleural or Peritoneal TB)
- মস্তিষ্ক বা মস্তিষ্কের পর্দার যক্ষ্মা (Tubeculoma of brain or TB Meningitis)
- রক্তে ছড়িয়ে পড়া যক্ষ্মা (Miliary TB)
- মেরুদণ্ডের যক্ষ্মা (Spinal TB)
- পেটের অঙ্গ-প্রতঙ্গের যক্ষ্মা (Abdominal TB)

ইত্যাদি।

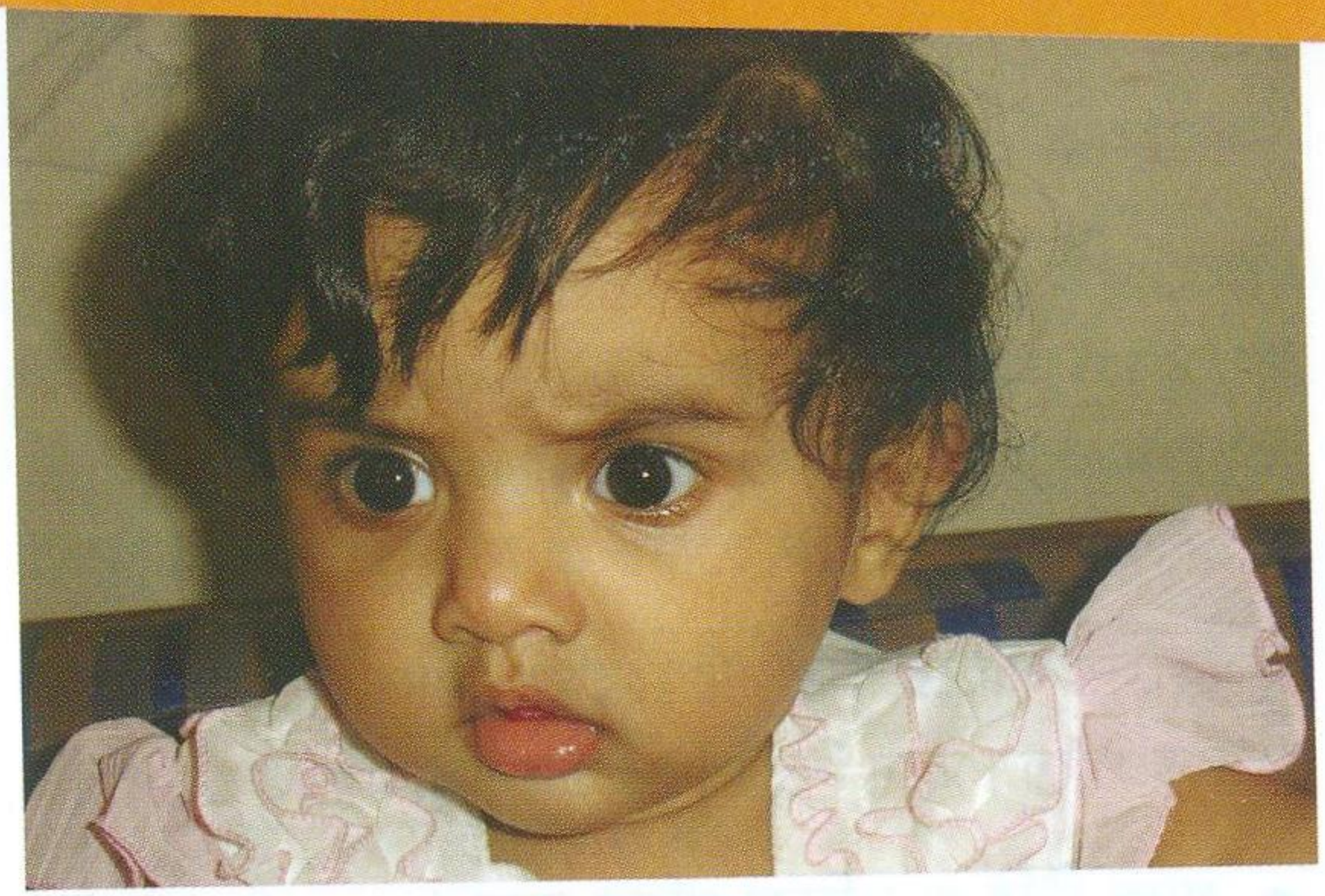

শিশুদের যক্ষ্মা রোগের লক্ষণ

- তিন সপ্তাহের বেশি কাশি থাকলে এবং কাশির জন্য সাধারণ এন্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা সত্ত্বেও কাশি ভাল না হলে
- দুই সপ্তাহব্যাপী জ্বর থাকলে
- শিশুর শরীরের ওজন কমে গেলে অথবা গত তিন মাসে শরীরের ওজন না বাড়লে
- শিশু আগের মতো খেলাধুলা না করলে কিংবা ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়লে।

ফুসফুসের বাইরে অন্যান্য স্থানে আক্রান্ত যক্ষ্মার লক্ষণগুলোর সাথে অন্যান্য লক্ষণও থাকতে পারে। এটা নির্ভর করে শরীরের কোন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আক্রান্ত হয়েছে তার উপর। সাধারণত যে সমস্ত লক্ষণসমূহ লক্ষ করা যায় তা হল-

- ঘাড় কিংবা বগলের কাছে ব্যথাহীন গুটি (Lymph node TB)
- কাশি ও শ্বাস কষ্ট (Pleural কিংবা Pericardial TB)
- পেটে ব্যথা, হজমে সমস্যা. ডায়রিয়া বা কোষ্ঠ কাঠিন্য বা উভয়ই, পেটে চাকা বা পানি আসা (Abdominal TB)
- মাথা ব্যথা, বমি, তন্দ্রাভাব বা ঝিমুনি, খিঁচুনি, ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া (TB Meningitis)
- মেরুদণ্ডের হাড় ফুলে উঠা বা বেঁকে যাওয়া (Spinal TB)
- অস্থিঃসন্ধিতে ব্যথা বা ফুলে যাওয়া (Bone কিংবা Joint TB) ইত্যাদি।

যক্ষ্মায় ঝুঁকিপূর্ণ শিশু কারা

- শিশুর শরীরে যক্ষ্মার জীবাণু প্রবেশ করে বড়দের কাছ থেকে। ফুসফুসে আক্রান্ত একজন যক্ষ্মা রোগীর সংস্পর্শে এলে শিশুর যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। পরিবারের কোনো সদস্য যদি যক্ষ্মায় আক্রান্ত হন তাহলে এ রোগ শিশুর মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এ ছাড়া নিকট আত্মীয়, প্রতিবেশী, শিশুকে লালন-পালনকারী, সহপাঠী, খেলার সাথী এদের কারো যদি যক্ষ্মা হয় এবং শিশু যদি তাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা, খেলাধুলা ও ওঠাবসা করে তাহলে তাদের কাছ থেকেও শিশুর শরীরে যক্ষ্মা ছড়াতে পারে। তবে বড় শিশুদের তুলনায় ১ মাস থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুরাই বেশি ঝুঁকিপূর্ণ কারণ এরকম শিশুরা তাদের সময়ের একটা বড় অংশ পরিবারের সদস্য, নিকট আত্মীয় ও খেলার সাথীদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সময় কাটায়। এ ছাড়া এমন বয়সী শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বড় শিশুদের তুলনায় কম থাকে।

- অপুষ্টিতে ভুগছে এমন যে কোনো বয়সী শিশু এ রোগের ঝুঁকিতে বসবাস করছে। অপুষ্টি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল করে দেয় যে কারণে শিশুরা খুব সহজেই বিভিন্ন ধরনের সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়। আমাদের দেশে শিশুদের মধ্যে হাম, হুপিংকাশি ইত্যাদি রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশি। এধরনের রোগে আক্রান্ত হলেও শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে যা যক্ষ্মা সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ায়। এছাড়া এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত শিশুদের মধ্যেও একই কারণে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়ার হার অনেক বেশি লক্ষ করা হয়।

- বিসিজি টিকা দেয়া না থাকলে কিংবা টিকা দেয়া হয়েছে কিন্তু কার্যকরী হয় নাই এমন ক্ষেত্রে শিশুর যক্ষ্মা হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি। বিসিজি দেওয়ার পরও শিশুর যক্ষ্মা হতে পারে তবে টিকা দেওয়া থাকলে মৃত্যু-ঝুঁকি'র মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় না। বিসিজি টিকা কার্যকরী না হলে টিকা দেওয়া স্থানে কোন ক্ষতচিহ্ন তৈরি হয় না।

শিশু যক্ষ্মা রোগী চিহ্নিতকরণে স্বাস্থ্যকর্মীদের করণীয়

শিশুর শরীরে যক্ষ্মার জীবাণু প্রবেশ করে সাধারণত বড়দের কাছ থেকে। কাজেই স্বাস্থ্যকর্মীগণ যে এলাকায় কাজ করেন সেখানে কোন যক্ষ্মায় আক্রান্ত ব্যাক্তির সন্ধান পেলে তার বাড়ি পরিদর্শন করবেন। পরিদর্শনকালে করণীয় কাজগুলো হলো-

- শিশুর পিতামাতার সঙ্গে আলাপ করা এবং কীভাবে রোগ শিশুর শরীরে প্রবেশ করতে পারে তার সম্ভাব্য উৎস জানার চেষ্টা করা

- শিশু কোনো যক্ষ্মা রোগীর সংস্পর্শে ছিলো কিনা সেই তথ্য লিপিবদ্ধ করা এবং সংস্পর্শে থাকা সকল শিশুর তালিকা প্রস্তুত করা
- প্রস্তুতকৃত তালিকা অনুযায়ী সকল শিশুকে চিকিৎসকের পরামর্শের জন্যে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রেরণ করা। জেনে রাখা ভালো, জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশের সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সদর হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বক্ষব্যাধি হাসপাতাল ও ক্লিনিক, নির্দিষ্ট এনজিও ক্লিনিক ও নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যক্ষ্মা রোগের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। রোগ সনাক্তকরণে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা এবং চিকিৎসার জন্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ এ সমস্ত কেন্দ্র থেকে বিনামূল্যে দেওয়া হয়। এ তথ্য স্বাস্থ্যকর্মীগণ শিশুর পিতামাতা/অভিভাবককে জানাবেন।
- চিকিৎসক রোগের লক্ষণযুক্ত শিশুদের জন্যে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন। এছাড়া যক্ষ্মার কোন লক্ষণ নাই এমন ৫ বছরের কম বয়সী সব শিশুদের প্রতিরোধক চিকিৎসা বা আইপিটি (বিস্তারিত পরে বর্ণনা করা হয়েছে) দিবেন।

- ফুসফুসের বাইরে যক্ষ্মার যে সমস্ত লক্ষণের কথা বলা হয়েছে সেগুলো সনাক্ত করে চিকিৎসকের পরামর্শের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া। সাধারণত ফুসফুসের বাইরে আক্রান্ত যক্ষ্মার ক্ষেত্রে আমাদের অজ্ঞতা, উদাসীনতা বা শিথিলতা লক্ষ করা যায়, যে কারণে শিশুদের এই ধরনের যক্ষ্মা রোগ সনাক্তকরণ কম হয়।

শিশুদের যক্ষ্মা রোগ নির্ণয়ে পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

- বড়দের যক্ষ্মা রোগ নির্ণয়ে কফ পরীক্ষা সর্বাধিক প্রচলিত রোগ নির্ণয় পদ্ধতি। যে সকল শিশু বড়দের মত কফ দিতে পারে তাদের রোগ নির্ণয় কফ পরীক্ষার মাধ্যমেই হয়। জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির পরিবর্তিত নীতিমালা অনুযায়ী ২টি কফ পরীক্ষার মাধ্যমে এ রোগ সনাক্ত করা যায়। সকালে সংগ্রহকৃত কফের নমুনা এবং রোগী যখন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সংগ্রহকৃত কফ নিয়ে উপস্থিত হয় তখন পুনরায় সংগ্রহ করা কফের নমুনা থেকে কফ পরীক্ষা করা হয়।
- কফের এই নমুনা দুটি মাইক্রোসকোপ দিয়ে পরীক্ষা করা হয় এবং দুটির মধ্যে একটিতে যক্ষ্মার জীবাণু পাওয়া গেলে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত বলে চিহ্নিত করা হয়।
- জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির আওতায় বর্তমানে বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে Gene X-pert নামক পরীক্ষণ যন্ত্রের প্রচলন করা হয়েছে। অত্যাধুনিক এই যন্ত্রের মাধ্যমে দ্রুত কফ পরীক্ষা করে ২ ঘন্টার মধ্যে পরীক্ষার ফলাফল জানা যায়।

- যে সকল শিশু কফ দিতে পারে না তাদের রোগ নির্ণয়ের জন্য বুকের এক্স-রে এবং চামড়ায় ম্যানটু পরীক্ষা করা হয়।
- ফুসফুসের বাহিরে শরীরের অন্যান্য স্থানের যক্ষ্মার ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক আক্রান্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপরে ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার পরামর্শ দিতে পারেন। স্বাস্থ্যকর্মীগণ এ ব্যাপারে পিতামাতাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করবেন যাতে অভিভাবকের মনে অকারণ কোন ভুল ধারণার সৃষ্টি না হয়।

শিশুদের যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য

শিশুর যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা বড়দের মতই ডটস্ পদ্ধতিতে করা হয়। এই পদ্ধতিতে একজন স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতিতে সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিশুকে ওষুধ খাওয়ানো হয়। চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধ নির্দিষ্ট মাত্রায় সংমিশ্রিত ট্যাবলেট বা fixed dose combination tablet আকারে পাওয়া যায়। যে সকল ওষুধ চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-

১. রিফামপিসিন
২. আইসোনিয়াজাইড
৩. ইথামবিউটল
৪. পাইরাজিনামাইড

একটি ট্যাবলেটে যখন রিফামপিসিন (৬০ মিঃ গ্রাম), আইসোনিয়াজাইড (৩০ মিঃ গ্রাম) ও পাইরাজিনামাইড (১৫০ মিঃ গ্রাম) এই তিনটি ঔষুধের সংমিশ্রণ থাকে তখন তাকে 3FDC বলা হয়। ঠিক একইভাবে যখন একটি ট্যাবলেটে রিফামপিসিন (৬০ মিঃ গ্রাম) আইসোনিয়াজাইড (৩০ মিঃ গ্রাম) থাকে তখন তাকে 2FDC বলে। ক্ষেত্রবিশেষে রোগের ব্যাপকতা ও আক্রান্ত স্থান ভেদে 3FDC এর সাথে ইথামবিউটল ট্যাবলেট কিংবা স্ট্রেপ্টোমাইসিন ইঞ্জেকশন ব্যবহারের প্রয়োজন হয়।

শিশুদের যক্ষ্মায় ব্যবহৃত FDC ট্যাবলেট বড়দের তুলনায় আলাদা যা পানিতে গুলে যায় ফলে ছোট শিশুদেরও এই ওষুধ খুব সহজেই খাওয়ানো যায়।

চিকিৎসা পদ্ধতির সুবিধার্থে রোগীকে ক্যাটাগরি-১, ক্যাটাগরি-২ ও ওষুধ প্রতিরোধী এই তিন গ্রুপে ভাগ করা হয়। ক্যাটাগরি-১ রোগীরা হলো- ফুসফুস কিংবা ফুসফুস বর্হিভূত যক্ষ্মায় আক্রান্ত নতুন রোগী। অন্যদিকে ক্যাটাগরি-১ চিকিৎসা সফল হয় নাই এমন রোগী, চিকিৎসা সম্পন্ন করেন নাই বা ডিফল্টার কিংবা সুস্থ হওয়ার পর পুনরায় যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়েছেন এমন রোগীগণ ক্যাটাগরি-২ এর আওতায় পড়েন। এ ছাড়া যে সকল রোগীর ক্ষেত্রে রিফামপিসিন ও আইসোনিয়াজাইড এই দুটি যক্ষ্মার ওষুধ কাজ করে না তাদেরকে ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা রোগী হিসেবে ধরা হয়।

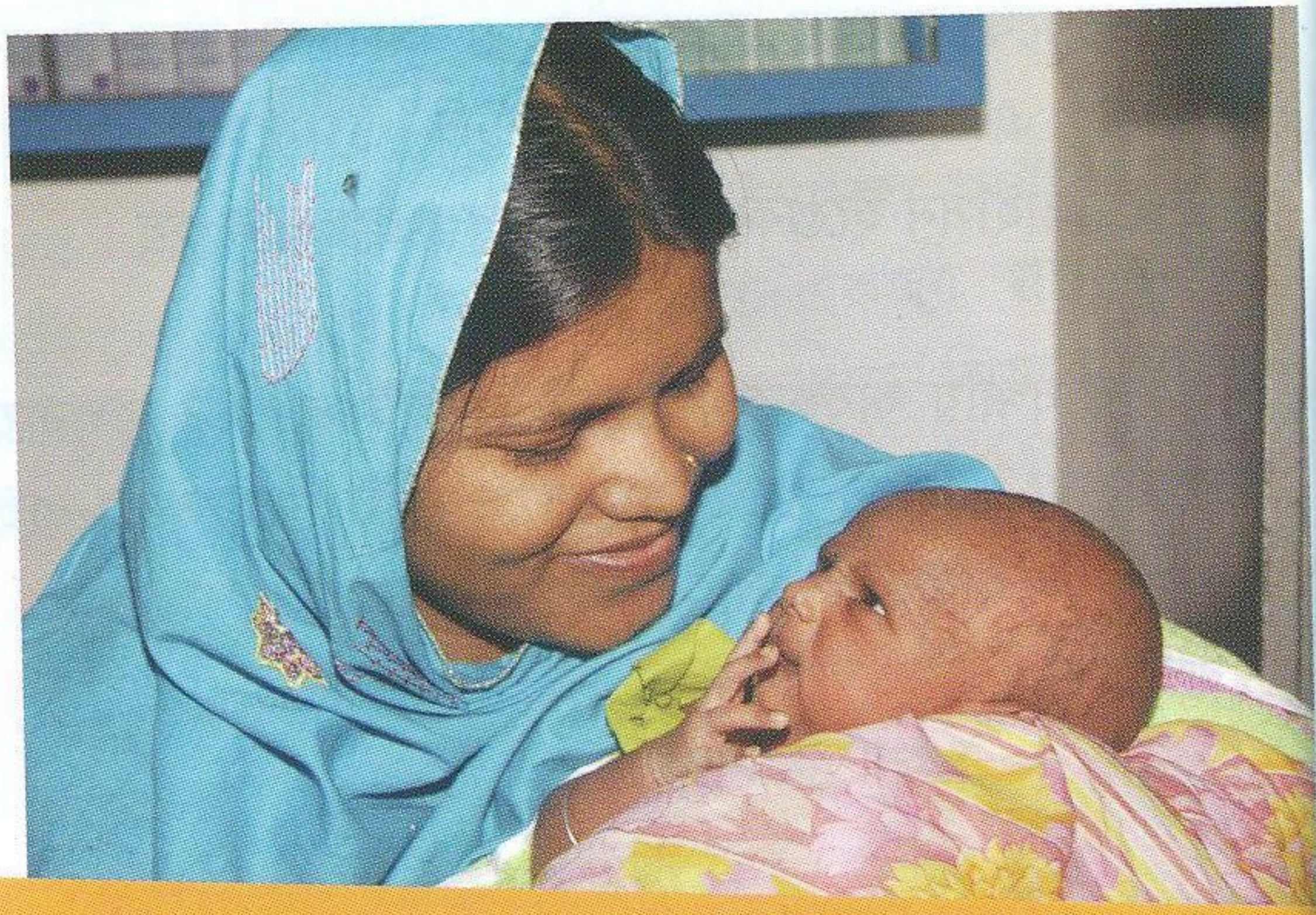

চিকিৎসার মেয়াদকাল ২টি পর্যায়ে বিভক্ত থাকে। প্রথম পর্যায় বা ইনটেনসিভ ফেজ (Intensive phase) ক্যাটাগরি-১ রোগীর ক্ষেত্রে চিকিৎসা শুরুকালীন সময় থেকে প্রথম ২ মাস। দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ কনটিনিউয়েশন ফেজ (Continuation phase) ফুসফুস আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে ৪ মাস। তবে ফুসফুস বহির্ভূত যক্ষ্মার ক্ষেত্রে এর মেয়াদ ১০ মাস পর্যন্ত হতে পারে। অন্যদিকে ক্যাটাগরি-২ রোগীর ক্ষেত্রে ইনটেনসিভ ও কনটিনিউয়েশন ফেজের মেয়াদকাল যথাক্রমে ৩ ও ৫ মাস। ক্যাটাগরি-২ রোগীর চিকিৎসায় চিকিৎসকগণের স্মরণে রাখা ভাল যে, ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা (Multidrug Resistant TB or MDR-TB)-এর চিকিৎসা সাধারণ যক্ষ্মা রোগ থেকে ভিন্ন পদ্ধতিতে করা হয় এবং এর ওষুধের সংখ্যা, ডোজ ও মেয়াদ কাল ভিন্ন হয়।

শিশু যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসাকালীন স্বাস্থ্যকর্মীদের করণীয়

চিকিৎসা চলাকালীন রোগীর ফলো-আপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এখানে স্বাস্থ্যকর্মীদের ভূমিকা অত্যন্ত জরুরি। এসময়ে শিশুকে প্রথম তিনমাস প্রতিমাসে ফলো-আপ করা হয়। চিকিৎসা কার্যকরী প্রমাণিত হলে শিশুর স্বাস্থ্যের সার্বিক উন্নতি ঘটে, রোগের লক্ষণসমূহ দূর হয় এবং ২-৩ মাসের মধ্যে ওজন বৃদ্ধি পায়।

প্রতিটি ফলো-আপ ভিজিটের সময়ে স্বাস্থ্যকর্মীগণ-

- শিশুর স্বাস্থ্যের পরিবর্তনগুলো লিপিবদ্ধ করবেন এবং ওজন নিবেন। মনে রাখা ভালো চিকিৎসায় শিশুর শরীরের ওজন বৃদ্ধি পেলে ওষুধের ডোজের পরিমাণ বৃদ্ধিরও প্রয়োজন হতে পারে।

- ফুসফুসের যক্ষ্মায় আক্রান্ত শিশুদের ফলো-আপ স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ওজন নেয়া ছাড়াও কফ পরীক্ষার মাধ্যমে করা হয়। এ ধরনের রোগীর ক্ষেত্রে বড়দের মতই ক্যাটাগরী-১ রোগী হলে ২য়, ৫ম ও ৬ষ্ঠ ও ক্যাটাগরী-২ রোগীর বেলায় ৩য়, ৫ম ও ৮ম মাসে কফ পরীক্ষা করানো নিয়ম। স্বাস্থ্যকর্মীগণ শিশুর পিতামাতা বা অভিভাবককে এই প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো অবহিত করবেন যাতে ফলো-আপে কোন ধরনের সমস্যা না হয়।
- স্বাস্থ্যকর্মীগণ ডট্‌স-এর গুরুত্ব রোগীর পিতামাতা বা অভিভাবককে ভাল করে বুঝিয়ে বলবেন এবং পূর্ণমেয়াদে চিকিৎসা সম্পন্ন করার উপর গুরুত্ব দিবেন। ডট্‌স না করলে কি সমস্যা বা বিপদ হতে পারে সেটাও অভিভাকদের পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলতে হবে।
- জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি প্রদত্ত ফর্ম-কার্ড যথাযথভাবে পূরণ করে নিয়মিত রিপোর্ট প্রদান করবেন।

চিকিৎসা চলাকালীন সমস্যাসমূহ

- ডট্‌স্‌-এর গুরুত্ব না বোঝা ও নিয়মিত ওষুধ না খাওয়া
- চিকিৎসা চলাকালীন ফলো-আপে না যাওয়া, পরীক্ষার গুরুত্ব না বোঝা ও প্রয়োজনীয় পরীক্ষা না করানো
- চিকিৎসার শুরু করার মাস খানেকের মধ্যেই শিশুর স্বাস্থ্যের সার্বিক উন্নতি ঘটে, বিভিন্ন উপসর্গ কমে যায়। এই সাময়িক উন্নতিকে অভিভাবকগণ রোগী সুস্থ হয়ে গেছে মনে করে চিকিৎসা বন্ধ করে দেয়।

- চিকিৎসা চলাকালীন সাধারণত শিশুর শরীরের ওজন বাড়ে। যক্ষ্মার ওষুধ যেহেতু ওজনের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয় সেহেতু ওজন বাড়ার সাথে সাথে ওষুধের ডোজেরও পরিবর্তন প্রয়োজন হয়। ফলো-আপের সময় বাচ্চার ওজন সঠিকভাবে না নেওয়া বা এই পরিবর্তন সম্পর্কে ডাক্তারকে না জানানো।
- শিশুর স্বাস্থ্যের সার্বিক উন্নতি ও ওজন বাড়ার সাথে সাথে প্রয়োজনীয় বাড়তি পুষ্টির ব্যবস্থা না করা।

ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও করণীয়

চিকিৎসা চলাকালীন ওষুধজনিত কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। ছকে এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এবং এই অবস্থায় করণীয় সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যকর্মীগণ অবশ্যই এ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নিবেন এবং শিশুর পিতা-মাতাকে অবহিত করবেন। লক্ষ রাখবেন- আপনার তথ্য তাদেরকে যেন শঙ্কিত কিংবা চিকিৎসা সম্পন্ন করায় নিরুৎসাহিত না করে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া	করণীয়
প্রস্রাব, ঘাম ও থুথু কমলা বা লাল হওয়া	এটা ক্ষতিকারক কোনো সমস্যা তৈরি করে না। অভিভাবককে আশ্বস্ত করতে হবে।
জন্ডিস	সাথে সাথে সমস্ত ওষুধ বন্ধ করতে হবে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তারের পরামর্শের জন্য পাঠাতে হবে।
চোখে ঝাপসা দেখা	সাধারণত ইথাম্বিউটল ওষুধের জন্য হয়। ইথাম্বিউটল বন্ধ করে দ্রুত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তারের পরামর্শের জন্য পাঠাতে হবে।
কানে কম শোনা বা কান ভোঁ-ভোঁ করা	স্ট্রেপ্টোমাইসিন ওষুধের জন্য হয়। ওষুধ বন্ধ করতে হবে ও প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্য ডাক্তারের কাছে পাঠাতে হবে।
চামড়া লাল হওয়া, দানা বা ফুস্কুরি হওয়া	সকল ওষুধ বন্ধ করতে হবে ও পরামর্শের জন্য ডাক্তারের কাছে পাঠাতে হবে।

শিশুদের যক্ষ্মারোগ প্রতিরোধের উপায়

ক. প্রতিরোধক চিকিৎসা পদ্ধতি

প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা পদ্ধতি হলো রোগ হওয়ার আগেই ওষুধ প্রয়োগ করে শিশুর শরীরে যক্ষ্মার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ বন্ধ করা। শিশু যক্ষ্মার জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয়েছে বা হতে পারে এমন সন্দেহ হলে সাথে সাথে প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই পদ্ধতি সফলভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে যক্ষ্মার চিকিৎসায় ব্যবহৃত আইসোনিয়াজিড ওষুধ একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় ৬ মাস ব্যবহার করা হয়। এজন্যে এই পদ্ধতির অপর নাম আইসোনিয়াজিড প্রিভেনটিভ থেরাপি (Isoniazid Preventive Therapy) বা INH preventive therapy । সংক্ষেপে একে আইপিটি (IPT) বলা হয়।

আইপিটি কার জন্যে প্রযোজ্য

- বাড়িতে বা পরিবারে ফুসফুসে আক্রান্ত যক্ষ্মা রোগী আছেন কিংবা গত এক বছরে পরিবারের কেউ যক্ষ্মা রোগে ভুগেছেন এমন কারো ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে থাকা ৫ বছর বয়সের কম বয়সী সকল শিশু।

- যক্ষ্মা রোগীর সাহচর্যে ছিল এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল এমন যে কোন বয়সের শিশু। যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রন কর্মসূচির আওতায় সাধারণত ১৫ বছরের কম বয়সীদেরকে শিশু সংজ্ঞায়িত করা হয়। পুষ্টিহীন, এইচআইভি এবং ক্রনিক রোগে আক্রান্ত শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সাধারণত কম থাকে এবং এমন শিশুরা খুব সহজেই যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হতে পারে। প্রতিরোধক চিকিৎসা পদ্ধতি এরকম শিশুদের বেলায় প্রয়োগ করা হয়। এ ছাড়া যে সকল শিশু স্টেরয়েড (Steroid) গ্রুপের ওষুধ যেমন প্রেড্নিসোলোন, হাইড্রোকর্টিসোন ইত্যাদির চিকিৎসা পাচ্ছে অথবা কেমোথেরাপি নিচ্ছে তাদের ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পরে। যক্ষ্মা রোগীর সাথে কন্ট্যাক্টের ইতিহাস আছে এমন শিশুদেরকেও আইপিটি দিতে হবে।
- আইপিটি শুধু যক্ষ্মার কোনো লক্ষণ নাই এমন শিশুর বেলায় প্রয়োগ করা যায়। যক্ষ্মার লক্ষণ প্রকাশ পেলে প্রতিরোধক ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না। আইপিটি চলাকালীন কোনো লক্ষণ প্রকাশ পেলে ওষুধ বন্ধ করে ডাক্তারকে অবহিত করতে হবে।

আইপিটি প্রয়োগ পদ্ধতি

- প্রথমেই কোন শিশু আইপিটি পাবে তা প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করতে হবে।
- প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত শিশুকে IPT প্রয়োগের জন্য জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠাতে হবে। একজন ডাক্তার দ্বারা শিশুকে পরীক্ষা করাতে হবে আইপিটি'র জন্য উপযুক্ত কিনা। ডাক্তার যদি লক্ষ করেন শিশুর মধ্যে যক্ষ্মার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে তাহলে আইপিটি প্রয়োগ না করে যক্ষ্মার চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
- চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত শিশুকে ডাক্তার তার ওজন অনুযায়ী আইসোনিয়াজিড ট্যাবলেটের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেবেন এবং নির্ধারিত ওষুধ শিশুকে এক নাগাড়ে ৬ মাস খাওয়াতে হবে। এ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য আইপিটি রেজিস্ট্রেশন ও ট্রিটমেন্ট কার্ডে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

- আইপিটি সাধারণত ডট্‌স পদ্ধতিতে করা হয় না। পিতা-মাতা বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ওষুধ খাওয়ানোর দায়িত্ব নিতে হবে। পিতামাতাকে ওষুধ খাওয়ানোয় উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করতে হবে, কারণ ওষুধ খাওয়ানো যদি অনিয়মিত হয় তবে আইপিটি কার্যকরী হয় না।
- আইপিটি'র জন্যে যে ধরনের আইসোনিয়াজাইড ট্যাবলেট ব্যবহার করা হয় তা পানিতে গলে যায়। এতে খুব ছোট শিশুও ওষুধ খেতে পারে। এ ছাড়া ভিটামিন সিরাপ বা ফলের রসের সাথে মিশিয়েও এ ওষুধ খাওয়ানো যেতে পারে।

শুধুমাত্র মায়ের দুধ পান করে এমন ৬ মাস বা তার কম বয়সী শিশুকে আইপিটি দেয়ার নিয়ম

যে মা শিশুকে শুধু বুকের দুধ পান করান তিনি বুকের দুধের সাথে মিশিয়েও এ ওষুধ শিশুকে খাওয়াতে পারবেন। আধাকাপ পরিমাণ দুধে নির্ধারিত পরিমাণ INH ট্যাবলেট গুলিয়ে নিয়ে বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে।

আক্রান্ত গর্ভবতী মা এবং সদ্যভূমিষ্ঠ সন্তানের জন্য চিকিৎসা

- মায়ের চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে।
- সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানকে আইপিটি দিতে হবে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক্তার নিবেন। মা তার শিশুকে বুকের দুধ স্বাভাবিকভাবেই খাওয়াবেন।
- আইপিটি চিকিৎসা চলাকালীন শিশুকে বিসিজি টিকা দেয়া যায় না। শিশুকে প্রথমে ৬ মাস আইপিটি দিতে হবে এবং আইপিটি চিকিৎসা শেষ হওয়ার পর বিসিজি টিকা দিতে হবে।

আইপিটি পদ্ধতি প্রয়োগে স্বাস্থ্যকর্মীদের করণীয়

- যে শিশু আইপিটি পাচ্ছে তার বাড়ি পরিদর্শন করে নিয়মিত তদারকি এবং পিতামাতা ও পরিবারের সদস্যদের উৎসাহ প্রদান করা।
- আইপিটি কার্ডে চিকিৎসার প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করা এবং চিকিৎসা চলাকালীন কোনোরূপ সমস্যা বা অসুবিধা হচ্ছে কি না সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।

- ওষুধের কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া লক্ষ করলে সাথে সাথে ডাক্তারকে জানানো। আইসোনিয়াজাইড ব্যবহারে নার্ভ-এর দুর্বলতা কিংবা জন্ডিসের মতো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। ডাক্তার প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিবেন।
- আইপিটি পাচ্ছে এমন শিশুকে প্রতিমাসে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসকের সাথে সাক্ষাতের জন্য পরামর্শ দেওয়া।
- জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি নিয়ম অনুযায়ী ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহায়তায় সকল আইপিটি'র ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন তৈরি করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া।

খ. প্রতিরোধের অন্যান্য পদ্ধতি

যক্ষ্মারোগের জীবাণু রোগীর শরীর থেকে বাতাসের মাধ্যমে ছড়িয়ে পরে। কিছু নিয়মকানুন মেনে চললে এই রোগজীবাণু ছড়ানো অনেকাংশে কমিয়ে আনা যায়, যেমন-

- হাঁচি-কাশি দেওয়ার সঠিক নিয়ম মেনে চলা। হাঁচি কিংবা কাশি দেওয়ার সময় রুমাল, টিস্যু বা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নিতে হবে। এগুলো সাথে না থাকলে মুখের উপর সরাসরি না দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে হাঁচি-কাশি দিতে হবে।

- যক্ষ্মারোগীর দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে, কারণ চিকিৎসা শুরুর সাথে সাথে জীবাণু সংক্রমণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। দ্রুত চিকিৎসা নেওয়ার আরেকটি সুফল হলো আক্রান্ত পিতামাতা কিংবা পরিবারের কোনো সদস্যের কাছ থেকে সুরক্ষার জন্য শিশুকে আলাদা করার কোনো প্রয়োজন হয় না।
- চিকিৎসা পাচ্ছে এমন রোগীকে রোগ নির্ণয়ের সময় থেকে চিকিৎসার প্রথম দুই মাস কাপড়ের মাস্ক ব্যবহারের পরামর্শ দিতে হবে।
- সুস্থ থাকার জন্য বাড়িতে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের উপস্থিতির প্রয়োজন। বায়ুবাহিত যক্ষ্মার ক্ষেত্রে এটা আরো বেশি প্রযোজ্য। কাজেই বাড়িতে পর্যাপ্ত আলো এবং বাতাসের উপস্থিতির সুবিধা কি সে বিষয়ে সবাইকে সচেতন হতে হবে।
- জন্মের পর পরই শিশুকে বিসিজি টিকা দেয়ার জন্য অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। বিসিজি টিকা শিশুর জীবন রক্ষা করে, পিতামাতার মনে এই বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করতে হবে।

আমাদের সন্তান আমাদের অত্যন্ত আদরের। তারা যক্ষ্মায় আক্রান্ত হবে এটা আমরা যেমন ভাবতে পারি না তেমনি দেখতেও চাই না। যে রোগ বাতাস দিয়ে ছড়ায় আমাদের সন্তানদের জন্য সেই বাতাসকে রোগমুক্ত রাখার দায়িত্ব আমার, আপনার, আমাদের সবার।

USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

World Health Organization

TB CARE II
BANGLADESH

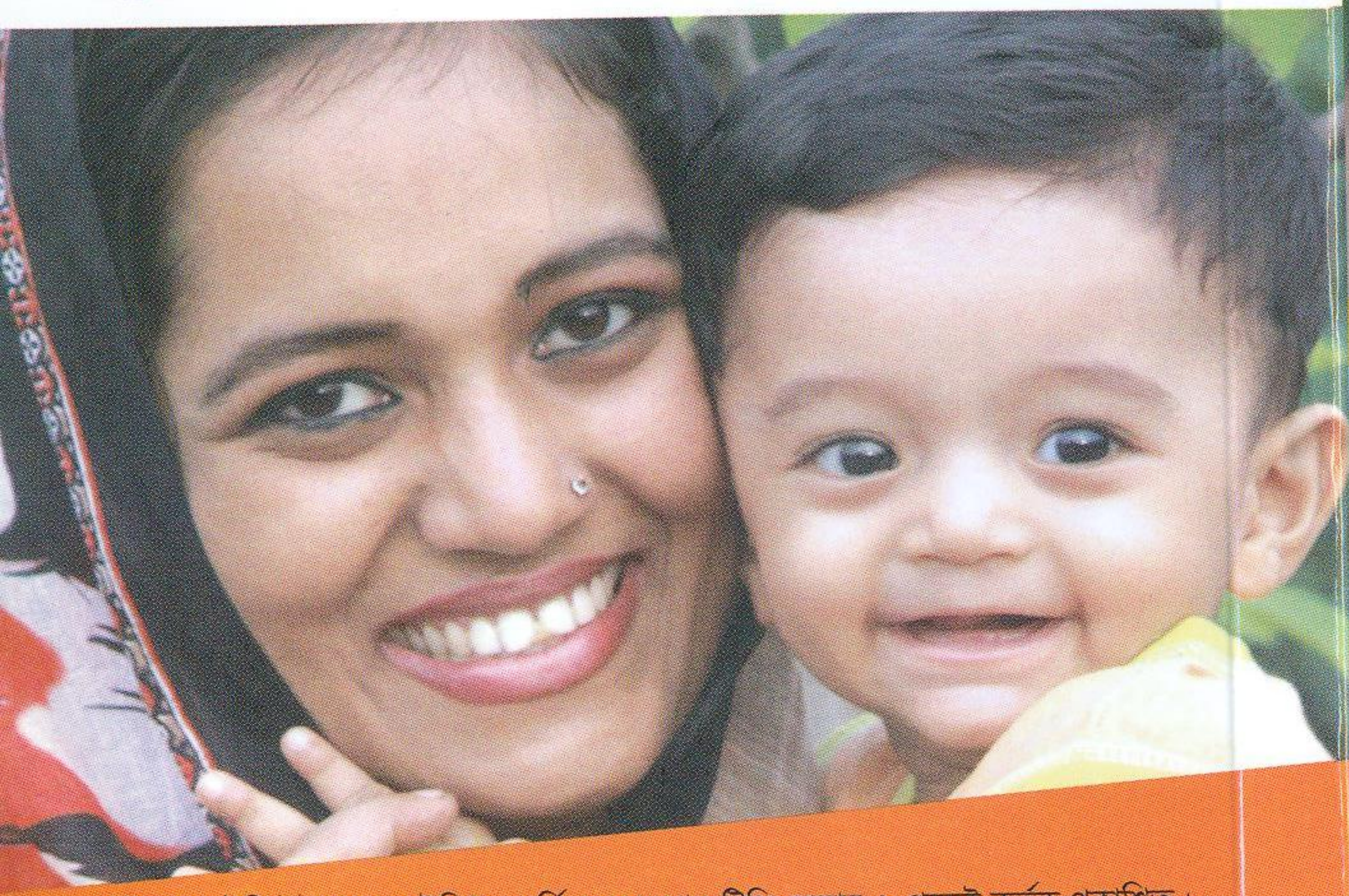

এই বুকলেটটি ইউএসএআইডি'র আর্থিক সহায়তায় টিবি কেয়ার-২ প্রজেক্ট কর্তৃক প্রকাশিত।
এখানে প্রকাশিত মতামতের সঙ্গে ইউএসএআইডি'র মতের মিল নাও থাকতে পারে।